একক ৪ ❑ গল্পের গাঁটছড়া ঃ সুকুমার সেন

৪.০ প্রবন্ধ—'গল্পের গাঁটছড়া'—সুকুমার সেন

৪.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

৪.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ

৪.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

৪.০ প্রবন্ধ—'গল্পের গাঁটছড়া'—সুকুমার সেন

মানুষের যেমন স্মৃতি আছে মানুষের গোষ্ঠীরও তেমনি স্মৃতি আছে, তবে তা আর এক ধরনের স্মৃতি। আপাতত মনে হতে পারে যে সে স্মৃতি তো ইতিহাস অথবা ইতিহাস-পুরাণ কাহিনী। কিন্তু তা নয়, ইতিহাসই বলি আর পুরাণ-কাহিনীই বলি তা তো ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তি সমষ্টিবিশেষের বুদ্ধি প্রমার্জিত রচনা। তার মধ্যে যা আছে তা মানুষের স্মৃতির পর্যালোচনা অথবা সে পর্যালোচনার তলানি। তাতে মানবগোষ্ঠীর স্মৃতির যেটুকু রঙ বা রস আছে—যদি থাকে—তা ধরা যায় না। মানব-গোষ্ঠীর স্মৃতি জমে আছে লোকসাহিত্যের মধ্যে—ছেলে-বুড়ো ভোলানো ছড়ার ও গল্পের মধ্যে। তবে তা এমনভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে যে টের পাওয়া খুবই দুর্ঘটনা।

মানুষের স্মৃতি মিশরের মমির মতো রক্ষিত হয়ে এসেছে তার লিখিত রচনায়—তার ধর্মকর্মের ব্যবস্থায়, তার পুরাণ-কাহিনীতে, তার জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে। আর মানব-গোষ্ঠীর স্মৃতি রয়ে গেছে—যদি থাকে—তার, যেমন প্রাচীনকালের পরিধেয় বসনের আঁচলের গিঁটে, সে গিঁট হল লৌকিক ছড়া ও গল্প। সে গিঁট খুলতে পারলে তার মধ্যে থেকে সেকালের স্মৃতির ক্ষীণ সৌরভ—নানা ফুলের, কর্পূরের মৃগনাভির, চন্দনের—যেন টের পাওয়া যায়।

বিদেশি পণ্ডিতেরা অনেক দিন থেকেই এইসব লৌকিক গল্প-ছড়ার গিঁট খুলে গাঁট ছাড়িয়ে ইতিহাসের নাগালের বাইরে যে প্রত্ন ও প্রাক ইতিহাস আর তারও অগোচর যে কালস্রোতের প্রতিধ্বনি তা কিছু কিছু যেন শুনতে পেরেছেন। আমাদের দেশ—ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে আমাদের প্রদেশ বঙ্গভূমি লোকসাহিত্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সত্যকার বিদগ্ধ ও যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তির সামনে গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে এই একটি।

আজ আমার এই আলোচনা তিনটি গল্প নিয়ে। একটি বাংলা ভাষার অপর দুটি জার্মান ভাষার। গল্পগুলির মধ্যে বাইরের মিল নজরে পড়বে না চট করে, তবে গিঁট গাঁট ছাড়িয়ে দেখলে তলায় সমভূমি পাওয়া যাবে। তখন বোঝা যাবে যে (গল্প তিনটি হয়ত একদা—কোন এক সুদূরকালের থেকে একই মানব-গোষ্ঠীর স্মৃতির টুকরো বহন করে এনেছে।)

বাংলা গল্পটি সংগ্রহ করেছিলেন বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা হ্যালেড (বা হ্যালহেড) ১৮০০ খৃষ্টাব্দের আগে। তাঁর লেখা কাগজপত্র ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সুতরাং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গল্পটি বাংলা লৌকিক গল্পের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রহণযোগ্য নিদর্শন। হ্যালেডের কাগজপত্র থেকে টুকে নিয়ে পুণ্যশ্লোক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছাপিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩২৮)। গল্পটি হয়ত অনেকেরই পড়া আছে। তবুও বলতে হচ্ছে আলোচনায় সুবিধার জন্যে। গল্পটি ভোজ-বিক্রমাদিত্য গল্পমালার (saga) মত গড়া। তাল-বেতাল

থাকলেও বেতাল পঞ্চবিংশতির মতো আগাগোড়া নয়। সংস্কৃত অথবা অন্য কোন ভারতীয় আর্য-ভাষায় গল্পটি মিলেছে বলে আমার জানা নেই। তবে কাহিনীর মধ্যে বিশিষ্ট বাঙালীত্ব অথবা বাংলা ঢঙ কিছু নেই।

ভোজপুরের রাজা ভোজের এক মেয়ে, অপূর্ব সুন্দরী, ষোল বছর বয়স কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি। তার কারণ মেয়ে প্রতিজ্ঞা করে আছেন, যে ব্যক্তি এক সারারাত্রি ধরে চেষ্টা করে তাকে কথা কওয়াতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে। এই তার স্বয়ংবরে মৌনব্রত। দিগ্‌বিদিকে খবর দিয়ে রাজা ভোজ অনেক রাজা রাজপুত্রকে আমন্ত্রণ করে আনালেন, কিন্তু কেউই রাজকন্যার মুখ খোলাতে পারে নি, বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেছে। বেশ কিছুকাল পরে অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কানে ভোজ রাজার অপূর্ব সুন্দরী মৌনব্রতধারিণী রাজকন্যার ব্যাপার পৌঁছল। তাঁর কৌতুহল এবং আগ্রহ জাগল। তিনি কাউকে কিছু না বলে সটান ভোজপুরে চলে গেলেন।

রাজবাড়িতে গিয়ে তিনি অতিথি হলেন কিন্তু আত্মপরিচয় দিলেন না। খবর পেয়ে রাজা তাঁকে ডাকলেন। বিক্রমাদিত্য পরিচয় না দিয়ে বললেন যে তিনি কন্যার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়ে তাকে বিবাহ করতে এসেছেন।

রাত্রিতে একঘরে দুটি খাটে বিছানা পাতা হল। সে খাটে রাজকন্যা ও বিক্রমাদিত্য শয়ন করলেন, আর কেউ রইল না। একটু রাত হতে বিক্রমাদিত্য হেঁকে বললেন, 'ঘরে কেউ আছে নাকি?' বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে সর্বদা দুটো পোষা ভূত থাকত। কেউ তাদের দেখতে পেতো না। তাদের নাম তাল-বেতাল। ঘরে ঢুকেই রাজা তাদের বলে দিয়েছিলেন রাজকন্যার খাট ও পরিধান আশ্রয় করতে। রাজার হাঁক শুনে তাল-বেতাল সাড়া দিলে, 'কেন মহারাজ?' বিক্রমাদিত্য বললেন, আর তো কেউ নেই। সাড়া দিলে কে তুমি?' তাল-বেতালের একজন বললে 'মহারাজ আমি রাজকন্যার খাট।' রাজা বললেন, 'ভাল তোমার সঙ্গে গল্প করে রাত কাটাই। শোন তুমি।'

'এক দেশে এক সদাগর জাহাজ ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে বাণিজ্যে গিয়েছিল। পরে তার জাহাজডুবি হয়। মরণাপন্ন হয়ে সে নদীর কিনারায় এসে পড়ে পাটা ধরে ভাসতে ভাসতে। এক মেয়ে জল আনতে গেলে তাকে দেখে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচায়। সদাগর সেইখানেই থেকে যায়। কিছু দিন পরে সে পড়ে এক ডাইনীর নজরে। ডাইনী মন্ত্র পড়ে সদাগরকে ভেড়া বানিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। রাত্রিবেলায় তাকে মানুষ করে আবার দিনের বেলায় ভেড়া করে দেয়। এক দিন সে ভেড়া, দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ে। রাজার লোকেরা তাকে কেটে তার মাংস খেয়ে ফেলে। এখন বল দেখি রাজকন্যার খাট, সদাগরের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে?'

খাট থেকে উত্তর এল, 'দায়ী সেই মেয়েলোক যে তাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়ে ছিল।'

রাজকন্যা এই উত্তর শুনে বিরক্ত হয়ে খাট ছেড়ে মাটিতে শয়ন করলে।

আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর আবার বিক্রমাদিত্য মুখ খুললেন। আর কে আছে হে ঘরে? রাজকন্যার কাছ থেকে কে যেন উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে আমি, মহারাজ!' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তুমি কে বটে ?' উত্তর এল 'আজ্ঞে আমি রাজকন্যার পরিহিত বস্ত্র।' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বেশ বেশ। একটা গল্প শোন।'

'এক দেশে এক সদাগরের মেয়ের বিয়ের জন্যে একই দিনে চার জন বর হয়ে এল। চার জনেই বিয়ে করতে চায়। বিষম ব্যাপার দেখে কনে ভয়ে মরে গেল রাত্রিবেলায়। সকালে চার জন বর তাকে বাইরে নিয়ে এল। সকলে কান্নাকাটি করতে লাগল। একজন শোকে আত্মহত্যা করলে, একজন নিজের ঘরে ফিরে গেল, একজন ওষুধ খুঁজতে বেরল, আর একজন দেহ আগলে রইল। যে ওষুধ আনতে গিয়েছিল সে ওষুধ এনে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তুললে।

'এখন বল দেখি রাজকন্যার কাপড়, কার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হওয়া উচিত?'

রাজকন্যার কাপড়ের কাছ থেকে উত্তর এল, 'যে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল তার সঙ্গেই বিয়ে হওয়া উচিত।'

উত্তর শুনে রাজকন্যার খুব রাগ হল। কিন্তু গায়ের কাপড় তো খুলে ফেলা যায় না। তা ভাবতেই হাসি পেল। রাজকন্যা খুব হেসে উঠল। আর অমনি বিক্রমাদিত্য তার হাত ধরে ফেললেন, 'এই তো মুখ খুলেছ।'

পরের দিন রাজকন্যাকে বিয়ে করে বিক্রমাদিত্য নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

এই গল্পটির সঙ্গে একটি জার্মান গল্পের গভীর ও অন্তরঙ্গ যোগ আছে। কিন্তু সে যোগ বাইরের থেকে সহজে ধরা পড়ে না। আগে গল্পটি শোনাই।

এক রাজদম্পতি অনেক সাধ্যসাধনা করে অবশেষে একটি কন্যা সন্তান লাভ করে। কিন্তু মেয়েটি প্রায় জন্মাবধিই ভূতগ্রস্ত ছিল। এই অবস্থায়ই যখন তার বয়স চোদ্দ তখন সে মারা যায়। তার দেহ কফিনে পুরে রাজবাড়ির সংলগ্ন গির্জা-ঘরে রাখা হয়। সেই ঘরে সৈনিক পাহারা থাকে। কিন্তু প্রতিদিনই রাত্রি বারোটা বাজলেই সেই ভূতগ্রস্ত মেয়েটি জেগে উঠে পাহারাদার সৈনিকের মুণ্ডপাত করে। পরের দিন নুতন পাহারাদার নিযুক্ত করতে হয়। এই ভাবে অনেকগুলি সৈনিক মারা গেল। রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কী করবেন ভেবে পান না। এত সৈনিক মারা পড়ল।

একদিন পাহারা দেবার ভার পড়ল এক তরুণ অথচ দক্ষ সৈনিকের উপর। তার অত্যন্ত ভয় হল। সে ডিউটিতে যোগ দেবার আগে বিকালে রাজার কাছে তিন চার ঘণ্টা ছুটি চেয়ে নিয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে বনের দিকে গেল। সেখানে সে এক বুড়োর দেখা পেল। সে এক কাঠের গুঁড়ির উপর বসে আছে। তাকে দেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে অত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?' সে বললে যে, তার উপর ভার পড়েছে রাত্রিতে রাজকন্যার মৃতদেহ পাহারা দেবার, কিন্তু যে পাহারা দেয় তারই মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়। শুনে বুড়ো তাকে সাহস দিয়ে বলল, 'ভাবনা নেই। তুমি এক কাজ ক'র। এই মন্ত্রপূত খড়ি নাও আর এই মন্ত্রপুত বস্ত্র নাও। গির্জাঘরে যেখানে বসে তুমি পাহারা দেবে তার চার দিকে এই খড়ি দিয়ে মণ্ডল এঁকে নিয়ো। আর তুমি রাত বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত মনকে কিছুতেই দমতে দিয়ো না। মৃতদেহ যখন কফিন থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে তখন সে চীৎকার করে বলবে, "আমি জানি তুমি এখানে রয়েছ, তবে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।" তার পরে সে ঘরময় ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তোমাকে দেখতে ও ছুঁতে পাবে না। এই ভাবে তোমার আজ রাত কাটবে।

সকালে উঠে রাজা লোকজন নিয়ে গীর্জাঘরে গেলেন। তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে পাহারাদারের মাথা বিচ্ছিন্ন হয়নি, সে স্বচ্ছন্দে আছে। সে সৈনিককে রাজা আদেশ করলেন আরও দু-রাত পাহারা দেবার জন্যে। কী করে সে, অগত্যা রাজি হল।

সেদিনও সে বিকালে ছুটি নিয়ে বনে গেল। বুড়োর সঙ্গে তার দেখা হল। এবারে বুড়ো তাকে উপদেশ দিলে সে রাত্রিতে অর্গানের পিছনে লুকিয়ে থাকতে আগের দিনের মতো খড়ি মণ্ড ল এঁকে। পাহারা দিতে এসে সৈনিক বুড়োর কথা মতো কাজ করলো। মাঝরাত্রি হতেই ভূতগ্রস্ত রাজকন্যা ঝাঁপ দিয়ে কফিন থেকে বেরিয়ে এল। আর ঘরময় দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াতে লাগল এই বলতে বলতে 'আমি জানি তুই এখানে আছিস্ কিন্তু তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।' রাত একটা অবধি সে এই রকম করতে লাগল। তারপর কফিনে ঢুকে পড়ল।

সকাল বেলা দলবল নিয়ে রাজা এলেন সৈনিকের মৃতদেহ সরিয়ে নিতে যেতে। কিন্তু এসে দেখলেন সে আগেকার দিনের মতই সুস্থ বহালতবিয়ৎ। তখন রাজা তাকে বললেন যদি সে আর এক রাত এইভাবে কাটাতে পারে তাহলে রাজকন্যা মানুষ হয়ে বেঁচে উঠবে এবং সে যদি চায় তবে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিতে পারেন।

তৃতীয় দিনে সৈনিক বিকালে ছুটি নিয়ে বনে গেল। বুড়োর সঙ্গে যথারীতি দেখা হল। বুড়োর উপদেশ সে চাইল। বুড়ো বলল, তুমি এবারে বেদীর পিছনে লুকিয়ে থেকো। ভূত কিন্তু আরও বেশি গোলমাল করবে, চারদিকে ছুটোছুটি করবে। তার মধ্যে ফাঁক পেয়ে সৈনিককে কফিনের মধ্যে ঢুকে পড়ে শুয়ে থাকতে হবে। তার পর ভূত যখন কফিনের কাছে এসে তাকে বেরিয়ে যেতে বলবে তখনও সে যেন সাড়াসুড়ি না দেয়। তার পর যখন তার হাত ধরে টানবে তখন সে যেন ভূতের তর্জনী ধরে ফেলে তাতে খুব জোরে কামড় দেয়।

সৈনিক উপদেশ মতো কাজ করলে পর রাজকন্যার ভূত ছেড়ে গেল, সে সুস্থ মানুষের মেয়ে হল। তখন দুজন বেদীর কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। লোকজনের সঙ্গে রাজা এসে তাদের দুজনকে এই ভাবেই দেখতে পেলেন। রাজা খুশি হয়ে সৈনিককে বললেন, 'তোমাকে জামাই করব।'

সকলে মহলে ফিলে এল। রাজকন্যার বিয়ে হল সৈনিকের সঙ্গে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হল।

[গল্পটি গ্রিমদের সংগ্রহে নেই। এটি সংগৃহীত হয় ১৯৩৫ সালে সাইলেসিয়ার হেড্‌উইগ সুরমান কর্তৃক। কুট রাজ্যে সংকলিত ও লটি বাউম্যান অনুদিত 'ফোক-টেলস অফ জার্মনী' ২৩ সংখ্যক গল্প॥]

—বিক্রমাদিত্যের গল্পের সঙ্গে সৈনিকের গল্পের গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে অমিলের মধ্যে দিয়ে। সে কেমন অমিলের মিল তা নিচে ছক্ বেঁধে দেখাতে চেষ্টা করছি। বাংলা ও জার্মান গল্পকে যথাক্রমে 'ক' ও 'খ' বলে চিহ্নিত করছি।

১। ক রাজকন্যা মৌনী, অন্তত রাত্রি বেলায় শয়ন কক্ষে। খ রাজকন্যা ভূতগ্রস্ত মৃত সুতরাং মৌনী। খাটে শুয়ে ক কন্যা মৃতবৎ থাকত। কেন না তা না হলে রাজা ডেকে বলতেন না, কে আছ এ-ঘরে। রাজকন্যা যখন খাটের উপর বিরক্ত হয়ে খাট ছেড়ে দিয়ে মাটিতে শুল তখন রাজা তা লক্ষ্য করেন নি। তবে কি ক কন্যা অদৃশ্য ভূত হয়ে ছিল। সে প্রকট হয়েছিল হাসিতে। তখন রাজা তার হদিস পেয়ে তার হাত ধরেছিলেন।

খ রাজকন্যার কফিনের মতো কি রাজকন্যার খাটও দুষ্টশক্তিসম্পন্ন (enchanted) ছিল। দুজনেই তাদের শয্যাধারের বাইরে এসেই তবে কাবু হয়েছিল। এবং সৈনিক তাতে ঢুকেই তবে ভূত তাড়াতে পেরেছিল। খ কাহিনীতে দুষ্টশক্তি রাজকন্যাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিল। ক কাহিনীতে শক্তির উল্লেখ নেই বটে তবে ছিল বলে মনে হয়। বিক্রমাদিত্যের গল্প বলে সে শক্তি রাজার সহকারী হয়েছে।

২। ক গল্পে কন্যা মৌনী, পাত্র (রাজা) মুখর। খ গল্পে পাত্র সৈনিক মৌনী, কন্যা (বা ভূত) মুখর। এখানে দুটি গল্পে মৌলিক পার্থক্য আছে। ক গল্পে তুক ভেঙে গেল কন্যা মুখ খুলতেই। খ গল্পে তুক ভেঙে গেল পাত্র (সৈনিক) মুখ খুলে কামড় দিতেই। এ দুটি মোটিফের মধ্যে যে মিল তা ভাসা ভাসা।

৩। ক গল্পে নায়ক বিক্রমাদিত্য প্রবীণ অসমসাহসী মন্ত্রবিদ্ গুণী। খ গল্পের নায়ক সৈনিক তরুণ সাহসী এবং বশংবদ। তাকে শক্তি দিয়েছে বনবাসী বুড়ো। বিক্রমাদিত্যকে শক্তি দিয়েছে তাঁর বুদ্ধি ও দুটি পোষা ভূত।

(গল্প দুটি সুদূর কালের কোন একটি গল্প থেকে শাখায়িত হয়েছিল।) জার্মান গল্পটিতে খ্রীষ্টান ধর্মের ছাপ পড়েছে। তবুও এটি মূল গল্পের বেশি কাছাকাছি। অনুমান করা যেতে পারে (১) গল্পটি সেকেলে ভূতের গল্প ছিল। রাজকন্যা ভূতের কবলে পড়ে জড়বৎ ছিল। সে ভূত প্রতি রাত্রিতে পাণিপ্রার্থী যুবককে গ্রাস করত। অথবা গল্পটিতে ভূত মোটেই ছিল না। রাজকন্যা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। ব্যর্থ পাণিপ্রার্থীদের সে প্রাণদণ্ড দিত।

গ্রিমদের সংগৃহীত একটি গল্পে (এ গল্পটিকে 'গ' বলব)—নাম সোনার হাঁস—ক গল্পের সঙ্গে মিল আছে শুধু হাসি-সমাধান মোটিফে। গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

এক গৃহস্থের তিন ছেলে ছিল। বড় ছেলে দুটি বুদ্ধিমান ও সুরূপ। ছোট ছেলেটি হাবাগোবা ভালো মানুষ। বড় ছেলে একদিন বনে যায় কাঠ কাটতে। মা তার সঙ্গে ভালো ভালো খাবার ও পানীয় দেয়। বনে ঢোকবার পর একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। লোকটি তার খাবারের কিছু ভাগ চায়। সে দেয় না। তার ফলে গাছ কাটতে গিয়ে সে পা কেটে ফেলে এবং শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে আসে। তারপরে চাষীর মেজ ছেলে বনে গেল কাঠ কাটতে। তার মনোভাব দাদার মতো ছিল সেও তাই আহত হয়ে ফিরে এল। তারপর যখন ছোট ছেলে বনে যেতে চাইলে তখন তার মা খুব অনিচ্ছা করে কিছু শুকনো রুটি আর বিস্বাদ পানীয় তার সঙ্গে দিলে। বনে গেলে পরে সেই লোকটি তার কাছে খাবার চাইলে ছেলেটি খুশি হয়ে তার সঙ্গে বাঁটোয়ারা করে খেলে। তখন লোকটি তাকে একটা গাছ দেখিয়ে তার গোড়া কাটতে বললে। সে গাছটার গোড়া কাটল আর তার মধ্যে পেল এক সোনার পালক হাঁস। হাঁসটি নিয়ে সে চলল শহর পানে। পথে রাত কাটাল সে এক গৃহস্থের বাড়ি অতিথি হয়ে। ভোরবেলা, তখনও ছেলেটি ঘুমচ্ছে, গৃহস্থের বড় মেয়ে এসে হাঁস দেখে তার একটা পালক খুলে নিতে গেল আর অমনি সে হাঁসের সঙ্গে এঁটে গেল। তারপর তার মেজ ও ছোট বোন পর পর এসে বড় বোনের সঙ্গে আটকে গেল।

সকাল হতে কিছু না বলে ছেলেটি হাঁসকে বগলে ধরে শহর মুখে চলল। পথে পাদরি মশায় দেখলেন তিনটি মেয়ে এক হাঁসকে ছুঁয়ে এক ছোকরার পিছু পিছু চলেছে। তিনি দূর থেকে তাদের চলে আসতে বললেন। কেউ এল না দেখে তিনি মেয়েগুলিকে জোর করে আনতে গেলেন, কিন্তু ছোঁয়া মাত্রই তিনিও আটকে গেলেন। তারপরে পাদরি মশায়ের কেরানী তাঁকে এইরকমভাবে তিনটি মেয়ের পিছু পিছু যেতে দেখে তাঁর কাছে ছুটে গেল এবং তাঁকে টেনে আনতে গিয়ে নিজেও আটকে গেল। এই ভাবে চাষী ছোকরার বগলে ধরা হাঁস ও সেই হাঁসের পিছনে সেঁটে থাকা পর পর পাঁচজনের বিচিত্র শোভাযাত্রা শহরের রাজপথ দিয়ে চলল।

এখন সে দেশের রাজার মেয়ে অত্যন্ত গম্ভীর-মেজাজ ও বিষণ্ণস্বভাব। সে হাসতে জানে না। রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাকে হাসাতে পারবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। রাজকন্যা জানালা থেকে রাজপথে এই বিচিত্র প্রোসেসন দেখে হেসে ফেললে। রাজা খুশি হয়ে ছেলেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

হাসির মোটিফটুকু ছাড়া এ-গল্পের সঙ্গে 'ক' গল্পের কোন মিল নেই। 'গ' গল্পের সঙ্গে 'খ' গল্পেরও একটুখানি মিল আছে। দুটি গল্পেই পাত্রকে শক্তি দিয়েছে বনবাসী ব্যক্তি। অরণ্যচারী দেবতা অথবা তার অদৃষ্ট।

তিনটি গল্পের কিন্তু জাত আলাদা দাঁড়িয়েছে। 'ক' গল্প পড়েছে বুদ্ধিদীপ্ত হাসিখুশির শ্রেণীতে, 'খ' গল্প রয়ে গেছে ভয়ভক্তিদৈবশক্তির শ্রেণীতে আর 'গ' গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সরলচিত্তের দৈবপ্রসন্নতার শ্রেণীতে। এর মধ্যে যে হাসিখুশির মোটিফ আছে তা অলঙ্কারের মতো, সমগ্র গল্পটিকে তা উদ্ভাসিত করেনি। 'ক' গল্পের যে হাসিখুশি মোটিফ তা সমগ্র গল্পটিকে উজ্জ্বল করেছে। এটা অবশ্য পরবর্তী কালে বুদ্ধিমার্জনার ফলেই রয়েছে।

'খ' গল্পের কফিন ও শবাচ্ছাদন বস্ত্র (shroud) ক গল্পে হয়েছে যথাক্রমে রাজকন্যার খাট ও তার পরিহিত বস্ত্র। (এ পরিবর্তন ভারতবর্ষের আচরণ ধারার অনুসরণেই সংঘটিত হয়েছে, আর এই শেষের পরিবর্তনটিকে ধরেই গল্পটিতে কৌতুকরসের ধারাটুকু উৎসারিত হয়েছে।) গোড়াতে গল্পটি ভয়-ভক্তি-ভূত-দৈবশক্তির শ্রেণীতেই ছিল। রাজকন্যাকে আশ্রয় করেছিল রক্তপায়ী ভূত (Vampire), সে পাহারাদারের মুণ্ড ছিঁড়ে রক্ত পান করতো। কে জানে 'ক' গল্পে আসলে হয়ত অকৃতার্থ পাত্রকে রাত্রি অবসানে কোতল করা হত। গল্পে সে কথা উহ্য রয়ে গেছে। ভালই হয়েছে।

৪.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি ঃ সুকুমার সেন (জন্ম : ১৬.১০.১৯০০-মৃত্যু : ৩.৩. ১৯৯২)

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেনের জন্ম বর্ধমান জেলায়। বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে থেকে বি. এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম. এ পাশ করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ 'The use of Cases in Vedic Prose' বিষয়ে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯৩৭ খ্রীঃ পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Historical Syntax of Indo-Arian'. পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তিনি প্রাচীন পার্শী আবেস্তার ভাষা ও দক্ষিণ ইরানের প্রাচীন রাজবংশের কথ্যভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। তবে শুধু ভাষাতত্ত্বই নয় গোয়েন্দা গল্প থেকে শুরু করে সাহিত্যের নানা শাখার তিনি বিচরণ করেছেন, প্রাচীন সাহিত্য থেকে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব উদ্ধারেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। তাঁর রচিত সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দি মিশিয়ে প্রায় একশ। কালিদাসের কাল ও চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি অভিনব পদ্ধতিতে গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-এ হিস্ট্রি অফ্ ব্রজবুলি লিটারেচর' (১৯৩৫), 'শেকসুভদয়া', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', 'রামকথার প্রাক ইতিহাস'(১৯৭৭), 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য', 'বটতলার ছাপা ও ছবি', 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি', 'ভাষার ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি। তাঁর রচিত অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের প্রকাশকাল হল : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চার খণ্ডে ১৯৪০-১৯৫৮) এটি একটি তথ্যপূর্ণ আকরগ্রন্থ। ইসলামী বাংলা সাহিত্য (১৯৫১); বাংলা সাহিত্যে গদ্য (১৯৩৪) ; কালিদাস তাঁর কালে (১৯৭৬); যিনি সকল কাজের কাজী (১৯৭৭), এ দুইটি গোয়েন্দা গল্পগ্রন্থ ; তাঁর সঙ্কলিত অভিধান ২ খণ্ডে An Etymological Dictionary of Bengali C1000-1800 AD প্রকাশিত হয় ১৯৭১। আত্মজীবনী 'দিনের পর দিন যে গেল' প্রথম পর্ব ১৯৮২ ; দ্বিতীয় পর্ব ১৯৮৬।

৪.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ ঃ

ব্যক্তি মানুষের স্মৃতির মত মানবগোষ্ঠীর ও স্মৃতি আছে। ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে থাকে ব্যক্তিমানুষের স্মৃতির পর্যালোচনা। মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি জমা থাকে লোকসাহিত্যে, ব্যক্তিমানুষের স্মৃতি সঞ্চিত থাকে লিখিত সাহিত্যে আর মানব গোষ্ঠীর স্মৃতি জমা থাকে মৌখিক সাহিত্যে। বিদেশী পন্ডিতেরা এইসব লৌকিক গল্পের গিঁট খুলে ইতিহাসের নাগালের বাইরের প্রাক্ ও প্রত্ন ইতিহাস কিছু কিছু খুঁজে পেয়েছেন। সাধারণভাবে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় লোকসাহিত্যের যে সমৃদ্ধি সেখানে যথার্থ পন্ডিত মানুষের কাছে এই ধরণের গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে আছে। একটি বাংলা ও দুটি জার্মান মোট তিনটি লোকগল্প নিয়ে আলোচনা করলে দেখানো যাবে যে, গল্প তিনটিতে কোনো এক সুদূর কাল থেকে একই মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি বয়ে এসেছে।

বাংলা গল্পটিকে সংগ্রহ করেন 'হ্যালেড' ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে। তাঁর কাগজ থেকে টুকে নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এটিকে ১৩২৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

ভোজপুরের রাজার ষোল বছরের সুন্দরী অ-বিবাহিতা মেয়ে মৌনব্রত পালন করেছে, তার প্রতিজ্ঞা এই যে, যে তাকে এক রাত ধরে চেষ্টা করে কথা বলাতে পারবে তাকে সে বিয়ে করবে। রাজা ভোজের আমন্ত্রণে বহু রাজপুত্র এলেও তারা বিফল হয়। শেষে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর দুই অদৃশ্য পোষা ভূত, তাল-বেতালকে সঙ্গে নিয়ে রাজকন্যাকে হাসাতে আসে। এক ভূত আশ্রয় নেয় রাজকন্যার খাটে, আরেক ভূত আশ্রয় নেয় রাজকন্যার গায়ের কাপড়ে। এরপর বিক্রমাদিত্য খাটের ভূতকে উদ্দেশ্য করে একটি গল্প বললেন ও গল্পের শেষে একটি প্রশ্ন করলেন। ভূতের উত্তর মনঃপূত না হওয়ায় বিরক্ত হয়ে রাজকন্যা খাট থেকে মাটিতে নেমে এলেন কিন্তু মৌনতা ভাঙলেন না। রাজা দ্বিতীয় আরেকটি

গল্প রাজকন্যার কাপড়ের ভূতকে উদ্দেশ্য করে বললেন ও গল্প শেষে প্রশ্ন করলেন। এবারও উত্তর শুনে রাজকন্যার রাগ হল। কিন্তু গায়ের কাপড় খুলতে হবে একথা ভেবেই সে হেসে উঠল, আর রাজা অমনি বলল 'এই তো মুখ খুলেছে' পরদিন দুজনের বিয়ে হল।

জার্মান গল্পটি এরকম—এক রাজদম্পতির জন্মাবধি ভূতগ্রস্থ কন্যা চোদ্দ বছর বয়সে মারা গেলে পরে তার মৃতদেহ কফিনে পুরে রাজবাড়ী সংলগ্ন গির্জা ঘরে রাখা হয় ও রাত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু দেখা যায় ভূতগ্রস্ত মেয়েটি প্রতি রাতে কফিন থেকে বেরিয়ে প্রহরারত সৈনিককে মেরে ফেলে। একদিন এক তরুণ দক্ষ সৈনিকের পাহারার ভার পরে। সে কি করবে চিন্তা করতে করতে বনে গিয়ে এক বৃদ্ধকে দেখে। বনবাসী বৃদ্ধ তাকে মন্ত্রমূত বস্ত্র ও মন্ত্রপূত খড়ি দেয়, যার সাহায্যে রাতে সৈনিক ভূতগ্রস্ত রাজকন্যার সামনে অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে ও বেঁচে যায়, এই ভাবে পরের রাতেও বৃদ্ধের সহায়তায় সৈনিক বেঁচে যায় তৃতীয় রাতে বৃদ্ধের পরামর্শে ভূতগ্রস্ত কন্যা থেকে বেরিয়ে এলে সৈনিক ঐ কফিনে ঢুকে পড়ে ও রাজকন্যার তর্জনী কামড়ে দেয়। এর ফলে রাজকন্যা ভূতমুক্ত হয় ও রাজা খুশী হয়ে দুজনের বিয়ে দিয়ে দেন।

এই দুটি গল্প বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গল্প দুটির মধ্যে গভীর মিল আছে। বাংলা গল্পটিকে 'ক' ও জার্মান গল্পটিকে 'খ' ধরলে দেখানো যায়—

এক) 'ক' ও 'খ' গল্পের দুই রাজকন্যার মধ্যেই মৌনতার মিল আছে। একজন রাতে মৌন থাকে বলে, অপরজন মৃত বলে। 'খ' গল্পে রাজকন্যা মৃত। 'ক' গল্পের রাজকন্যা রাতে মৃতবৎ। দুটি গল্পের শয্যাধারই দুষ্টশক্তিসম্পন্ন। 'খ' গল্পে দুষ্টশক্তি রাজকন্যাকে আয়ত্ত করেছিল। 'ক' গল্পে এই শক্তি বিক্রমাদিত্যের সহকারী।

দুই) 'ক' গল্পে মৌনী কন্যা মুখ খুলতেই তুক ভেঙ্গে গেছে। 'খ' গল্পে সৈনিক মুখ খুলে কামড়াতেই তুক ভেঙ্গে গেছে। অর্থাৎ দুটি গল্পে 'মুখ খোলা' মোটিফের ভাসা ভাসা মিল আছে।

তিন) দুটি গল্পেরই নায়কের অসমসাহস। একজনকে শক্তি দিয়েছে নিজের বুদ্ধি ও পোষা ভূত, অপরকে বনবাসী বৃদ্ধ।

সোনার হাঁস নামে গ্রীম ভাইদের সংগৃহীত আরেকটি গল্প আছে। আলোচনা করলে দেখা যাবে 'ক' গল্পের সঙ্গে এই গল্পের মিল আছে। মিলটি হল 'হাসি-সমাধান' মোটিফ।

এক গৃহস্থের তিন ছেলে বড় দুটি বুদ্ধিমান। বড় ছেলে একদিন বনে যায় কাঠ কাটতে সঙ্গে নেয় ভালো খাবার ও পানীয়। বনে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়, সে খাবার চায়, বড় ছেলে দেয়না। কাঠ কাটতে গিয়ে পা কেটে ফেলে ও শূন্য হাতে ফিরে আসে। মেজ ছেলের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে। ছোট ছেলে সরল। সে কাঠ কাটতে যাওয়ার সময় মা খারাপ খাবার দেয়, বনবাসী ব্যক্তি খেতে চাইলে তার সঙ্গে ভাগ করে নিজের খাবার খায়। বনবাসী ব্যক্তির কথানুযায়ী এরপর সে একটি গাছের গোড়া কেটে একটি হাঁস পায় ও তা নিয়ে শহরের দিকে যায়। পথে এক গৃহস্থের বাড়ীতে রাত কাটায়। ভোরবেলা গৃহস্থের বড় মেয়ে হাঁসের গায়ে সোনার পালক দেখে খুলতে গিয়ে হাঁসের সঙ্গে আটকে যায়। পরে তার ছোট দুই বোনেরও একই অবস্থা হয়। ছেলেটি হাঁসটিকে বগলে নিয়ে শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করলে এঁটে থাকার দরুন তিন মেয়েও হাঁসের সঙ্গে হাঁটতে থাকে। পথে পাদরী মেয়েদের ডাকতে গিয়ে নিজেও এঁটে যায়। এর পর যুক্ত হয় পাদরীর কেরানী। ফলে শহরের পথ দিয়ে চাষী ছেলেটি ও তার বগলে ধরা হাঁসের সঙ্গে পাঁচজনের এক বিচিত্র শোভাযাত্রা যেতে থাকে। তা দেখে রাজ্যের গম্ভীর মেজাজ ও বিষন্ন স্বভাবের রাজকন্যাও হেসে ওঠে। রাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কেউ তাঁর মেয়েকে হাসাতে পারলে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। ফলে ছেলেটির সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

'ক' গল্পের সঙ্গে এই গল্পের হাসির মোটিফ মিল, আর 'খ' গল্পের সঙ্গে মিল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই পাত্রকে শক্তি দিয়েছে বনবাসী ব্যক্তি। তিনটি গল্পের শ্রেণী আলাদা। 'ক' গল্প বুদ্ধিদীপ্ত হাসিখুশী শ্রেণীর। 'খ' ভয়ভক্তি দৈবশক্তির, 'গ' সরলচিত্তের দৈবপ্রসন্নতার।

'খ' গল্পের কফিন ও শবাচ্ছাদান বস্ত্র ভারতবর্ষের আচরণ ধারা অনুসারে 'ক' গল্পে রাজকন্যার খাট ও পরিহিত বস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এর ফলেই দুটি কৌতুক শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। প্রথমে এটি ভয়-ভক্তি-ভূত-দৈবশক্তি শ্রেণিভুক্ত ছিল। যেমন, 'খ' গল্পে রাজকন্যাকে রক্তপায়ী ভূত আশ্রয় করেছিল। সেই ভূত রাতে পাহারাদারের মুণ্ডু ছিঁড়ে নিত। তেমনি 'ক' গল্পেও হয়ত অকৃতার্থ পাত্রকে সকালে কোতল করা হত, যা গল্পে উহ্য থেকে ভালোই হয়েছে।

৪.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ ঃ

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন শুধু যে ভাষার জগতেই তাঁর জ্ঞানস্পৃহাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তা নয়, জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এরকম একটি ক্ষেত্র হল লোকসাহিত্য। 'গল্পের গাঁটছড়া' নামে তাঁর যে প্রবন্ধ, তার বিষয়ও লোকসাহিত্য। এই প্রবন্ধটি প্রথম ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে 'গল্পের গাঁটছড়া' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যেই এটি সংযোজিত হয়। তিনি এই প্রবন্ধে একটি বাংলা লোকগল্প ও দুটি জার্মান লোকগল্পকে বিশ্লেষণ করে, গভীরে তিনটি গল্পের মিলের জায়গা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রাবন্ধিকের মতে ব্যক্তিমানুষের যেমন স্মৃতি থাকে, তেমনি মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি থাকে। বক্তিমানুষের স্মৃতি প্রতিফলিত হয় ইতিহাস বা পুরাণ কাহিনিতে। সেখানে থাকে বক্তিমানুষের স্মৃতির পর্যালোচনা। কিন্তু ইতিহাস বা পুরাণ থেকে মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি পাওয়া যায়না। মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি লুকিয়ে আছে লোকসাহিত্যে, বিশেষ করে লোককথায়। ব্যক্তিমানুষ তার স্মৃতিকে রক্ষিত করেছে লিখিত সাহিত্যের মধ্যে। আর মানব গোষ্ঠীর স্মৃতি রয়ে গেছে মৌখিক সাহিত্যে। সেই মৌখিক সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করে বিশ্লেষণ করতে পারলে পাওয়া যাবে প্রাগৈতিহাসিক মানবগোষ্ঠীর জীবন-যাপন প্রণালী থেকে শুরু করে স্মৃতির বহু টুকরো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, লোকসংস্কৃতির মধ্যে যে একটি জাতির শিকড় লুকিয়ে থাকে, এই বোধে উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই মানুষ পৌঁছে গেছে। উনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফিনল্যান্ডে জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণাতেই লোককথা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরে। শুধু সংগ্রহই নয় ফিনল্যান্ডেই প্রথম লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞাননির্ভর ও বস্তুতান্ত্রিক গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এবং মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারাকে উপলব্ধি করার পক্ষে এক প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে হাজির হল। প্রাবন্ধিক সুকুমার সেনও সাধারনভাবে ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকসাহিত্য নিয়ে এই ধরনের গবেষণা হবে আশা প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি হ্যালহেড সংগৃহীত একটি বাংলা লোকগল্প ও দুটি জার্মান লোকগল্প, একটি হেড্‌উইগ সুরমান, ও অন্যটি গ্রীস ভাইদের (জেকঁব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রিম (১৭৮৫-১৮৬৩), উইলল্‌েস কার্ল গ্রিম (১৭৮৬-১৮৫৯) সংগৃহীত, মোট তিনটি গল্পের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। গল্পগুলির শ্রেণীবিশ্লেষণ করেছেন ও গল্পগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ মোটিফে মিল আছে তা দেখিয়ে দেন।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লোককথা সংগ্রহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোককথা বিশ্লেষণের পদ্ধতি, তত্ত্ব ও নানারকম মতবাদ তৈরী হয়। ১৮৩৫ খ্রীঃ জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রিম একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন 'Deutsche Mythopagic',

এখানে জেকঁবের মননশীল আলোচনার ফলে তাকে 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের জনক' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ লোককথার পদ্ধতিগত আলোচনা করেছেন। লোককথা বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি হল—ক) **তুলনামূলক পদ্ধতি :** এই পদ্ধতির জনক গ্রিম ভাইরা হলেও পরবর্তীকালে ম্যাক্স ম্যুলার বা থিওডোর বেনফেও এই পদ্ধতিতে লোককথার বিশ্লেষণ করেন।

খ) **ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি :** ফিনল্যান্ডের দুই লোকসংস্কৃতিবিদ্ জুলিয়াস ক্রোন ও তাঁরপুত্র কার্লে ক্রোন এই পদ্ধতির স্রষ্টা। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেও অসংখ্য লোককথার ইতিহাস ও কালানুক্রমিক ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভভব হয়েছে।

গ) **মনঃসমীক্ষাগত পদ্ধতি :** মূলতঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে কার্ল আব্রাহাম লোককথায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান

ঘ) **ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি :** মার্কস—এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারনার ওপর নির্ভর করে জর্জ টমসন, আর্নর্ঘ ফিশার প্রমুখ লোকসাহিত্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন।

ঙ) **জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি :** জার্মানিতে অ্যাডল্ফ্ হিটলার এই পদ্ধতির জনক। পরবর্তীকালে জাপানেও এই পদ্ধতি খুব জনপ্রিয় হয়, জাপানে জার্মানি লোকসংস্কৃতিবিদ ইয়ানাগিত এই পদ্ধতির প্রধান প্রবক্তা।

চ) **নৃবিজ্ঞানগত পদ্ধতি :** এই পদ্ধতির পথিকৃৎ হলেন ফ্রানজ বোয়াজ নামে এক জার্মান-আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী।

ছ) **রাপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি :** সাম্প্রতিককালে লোকসংস্কৃতি আলোচনায় সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বিতর্কিত পদ্ধতি এটি। সোবিয়েত ইউনিয়নের লোকসংস্কৃতিবিদ ভ্লাদিমির প্রপ এই পদ্ধতির জন্মদাতা। পরবর্তীকালে ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লাদ লোভি-স্ট্রস (নোয়াম চমস্কি, অ্যালান ভানডেস প্রমুখ) এই পদ্ধতিকে আরো বিকশিত করেন।

এর মধ্যে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতি থেকে পরবর্তীকালে দুটি ধারনার জন্ম হয় টাউপ ইনডেক্স ও মোটিফ্ ইনডেক্স। এই দুটি ধারনা লোকসংস্কৃতি চর্চায় ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অ্যান্টি আর্নে ও স্টিস টমসন এই ধারনা হাজির করেন। বিপুল পরিমানে সংগৃহীত লোককথার শ্রেণিবিন্যাস করার জন্য টাইপের ধারণা আনা হয়। অ্যাণ্টি আর্ণে টাইপের সংজ্ঞায় বলেছেন—'A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale, but the fact that it may appear alone attests its independence.' মোটিফ এর সংজ্ঞা নির্ধারণে টমসন বলেছেন, 'A motif is the smallest elements in a tale having a power to persist in tradition.'

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন লোককথাগুলি সংগৃহীত হচ্ছিল এবং তার পরবর্তীতে যখন লোককথাগুলি বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল, তখন লোকসংস্কৃতিবিদ্দের মধ্যে যে বিতর্কগুলি ছিল, সেগুলি হল—সমস্ত লোককথা একই উৎস থেকে উদ্ভূত কিনা? একই উৎস হলে উৎসটি কোথায়? একস্থান থেকে অন্যস্থানে যখন লোককথাগুলি পরিভ্রমণ করেছে তখন এর পরিবর্তনগুলি কিভাবে বোঝা যাবে ইত্যাদি। প্রাবন্ধিকও এখানে তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত লোককথাকে তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই বিশ্লেষণে তিনি সাহায্য নিয়েছেন টাইপ ও মোটিফ এর ধারণার। মোটিফ শব্দটি তিনি ব্যবহার করলেও টাইপ শব্দটি তিনি ব্যবহার করেননি, করেছেন 'জাত' বা 'শ্রেণী' শব্দটি।

প্রথম গল্পটিকে তিনি বলেছেন 'বুদ্ধিদীপ্ত হাসিখুশি' শ্রেণির। দ্বিতীয় গল্পটিকে তিনি বলেছেন 'ভয়ভক্তি-দৈবশক্তি'

শ্রেণির এবং তৃতীয় গল্পটিকে তিনি 'সরলচিত্তের দৈবপ্রসন্নতা' শ্রেণিভুক্ত করেছেন। তিনটি ভিন্ন উৎসের এবং ভিন্ন 'জাতের' গল্প নিয়ে তিনি গল্প তিনটির মিল দেখিয়েছেন কতগুলি 'মোটিফ্' এর সাহায্যে। 'ক' ও 'খ' গল্পে তিনি যে মোটিফগুলির মিল পেয়েছেন, সেগুলি—

১. মৌনতা

২. দুষ্টশক্তিসম্পন্ন শয্যাধার

৩. দুষ্টশক্তির অস্তিত্ব

৪. মুখ খোলার মধ্যে সমস্যার সমাধান

৫. অসমসাহসী পাত্র।

'ক' ও 'গ' গল্পে মিল হ'ল উভয় ক্ষেত্রেই—বনবাসী ব্যক্তি শক্তিদাতা। এই মোটিফগুলির মধ্যে যেহেতু মিল আছে, ফলে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, গল্প তিনটি একই উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে বিভিন্ন শাখায় শাখায়িত হয়েছে এবং তাতে নানা প্রভাব পড়েছে। জার্মান গল্পটিকে তিনি মূল গল্পের বেশী কাছেরবলে অনুমান করেছেন, এবং ভারতবর্ষে যে গল্পটি সংকলিত হয়েছে, অর্থাৎ 'ক' গল্পটি তাতে 'খ' গল্পের কফিন ও শবাচ্ছাদন ভারতবর্ষের সংস্কৃতিক ধারা অনুযায়ী খাট ও রাজকন্যার পরিহিত বস্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ গল্পতিনটির উৎসস্থল হিসেবে তিনি জার্মানী বা তার আশেপাশের অঞ্চলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লোককথা বিশ্লেষণের যে তুলনামূলক পদ্ধতি সেখানে গ্রীম ভাইরা একটা বক্তব্যকে খুব জোরের সঙ্গে হাজির করার চেষ্টা করেছিলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সংগৃহীত যে লোককথাগুলির সঙ্গে জার্মান ভাষায় সংগৃহীত লোককথার মিল পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলি আসলে জার্মান ভাষা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। এই তত্ত্বের নাম দেওয়া হয় 'পুরাকাহিনীর ভগ্নাংশ তত্ত্ব'। পরবর্তীকালে জোহানেস বোল্‌ট ও জর্জ সোলিভকা গ্রীম ভাইদের সংগৃহীত কাহিনী সমূহের সমকালীন ও সমধর্মী অনেক কাহিনী উল্লেখ করে সেগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে গ্রীস ভাইদের তত্ত্বকে সমর্থন জানালে ও পরবর্তী সময়ে লোকসংস্কৃতিবিদ্‌রা গ্রীম ভাইয়ের এই তত্ত্ব বাতিল করে দেন।

এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক 'মোটিফ' নিয়ে যে খুব গভীরে আলোচনা করেছেন তা নয়, প্রাবন্ধিক শুধু সেই মোটিফগুলো নিয়েই আলোচনা করেছেন। যে মোটিফগুলি গল্প তিনটির এক উৎস নির্ণয়ে সহায়ক হবে। এই মোটিফগুলি ছাড়াও গল্প তিনটিতে আরো মোটিফ আছে যেমন—

'ক' গল্পে — কাজের ভার : কাউকে হাসাতে হবে,

'খ' গল্পে — নিষেধাজ্ঞা : রাজকন্যারূপী ভূতের সামনে মুখ না খোলা (কথা না বলা)

— যাদুপোষাক

— যাদুবস্তু অদৃশ্য হতে সাহায্য করে

'গ' গল্পে — অস্বাভাবিক গাছ

— কাজের ভার : কাউকে হাসাতে হবে

— উদারতার পুরস্কার

— জাদুপালক

প্রভৃতি। এই মোটিফগুলি ভারতে প্রাপ্ত গল্পে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, ফলে ম্যাক্স ম্যুলারের মত কেউ সিদ্ধান্ত করতেই পারত সমস্ত লোকগল্পের উৎস ভারতবর্ষ। ফলে উৎস নির্ণয়ে না গিয়ে, মানবস্মৃতি যে লোকগল্পে জমা থাকে সেই দিক থেকেই লোকগল্পের আলোচনার মূল জায়গা হওয়া উচিত। প্রবন্ধের নামটির মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিক যে ভাষাবিজ্ঞানী

তার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ ভাষাবিজ্ঞানে লিপির আলোচনায় শাড়ির গিঁট কে লিপির পূর্বসূরী বলা হয়। এই গিঁট এর সঙ্গে কোনো স্মৃতির অনুষঙ্গ থাকে।

❑ অনুশীলনী

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী ঃ

১. 'ভেজাল ও নকল' প্রবন্ধে রাজশেখর বসু মূলত যে কথা বলতে চেয়েছেন, সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করুন।

২. ভেজাল এবং নকল রোধের জন্য রাজশেখর বসু তাঁর প্রবন্ধে যেসব ব্যবস্থা নেবার কথা বলেছেন, সেগুলি কী-কী, বলুন।

৩. 'ভেজাল ও নকল' ঠিক কোন্ শ্রেণির প্রবন্ধ, বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলুন।

৪. ভেজাল এবং নকলের প্রসার ও প্রাদুর্ভাবের জন্য বস্তুতপক্ষে কারা দায়ী, বিশ্লেষণ করে দেখান।

৫. ভেজাল-নকল রোধ করতে গিয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, রাজশেখর বসুর অনুসারে বলুন।

৬. আমাদের মানসিকতার উপরে রূপকথা কতখানি প্রভাব ফেলতে পারে বলে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন, আলোচনা করুন।

৭. রূপকথার বিরুদ্ধে কী-কী অভিযোগ ওঠে? কেন? এগুলি কতখানি গ্রহণযোগ্য, বিচার করুন।

৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রূপকথা সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেছেন, তার বিশ্লেষণ করুন।

৯. প্রকৃতি এবং ইতিহাসকে অবলম্বন করে বাঙালির সংস্কৃতি যেভাবে গড়ে উঠেছে, আলোচনা করুন।

১০. 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে ইংরেজ-সংস্পর্শে আসার পরে বাঙালি সংস্কৃতির যে পর্যায়-বিবর্তন ঘটেছে বলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন, সে-সম্পর্কে আপনার অভিমত জানান।

১১. 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কী-কী বলতে চেয়েছেন, বিশ্লেষণ করুন।

১২. 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙালি জাতিকে কর্মে ও শ্রমে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করার কথা বলেছেন কেন, আলোচনা করুন।

১৩. 'গল্পের গাঁটছড়া' বলতে সুকুমার সেন কী বোঝাতে চেয়েছেন, আলোচনা করুন।

১৪. 'গল্পের গাঁটছড়া' সুকুমার সেন কীভাবে তিনটি গল্পের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন, বিশ্লেষণ করুন।

১৫. লোককথা বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে কী-কী পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় বলে সুকুমার সেন বলেছেন, বিশ্লেষণ করে দেখান।

১৬. লোককথা বিশ্লেষণে, মোটিফ ব্যাপারটি কী? সুকুমার সেন তাঁর 'গল্পের গাঁটছড়া' প্রবন্ধে কোন্-কোন্ মোটিফের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন? আলোচিত গল্পগুলিতে আর কী কী মোটিফ দেখা যায়? আলোচনা করুন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. নন্দ গোয়ালা এবং শিউরাম পাঁড়ের বক্তব্য কী ছিল? সংক্ষেপে প্রতিবেদন করুন।

২. সরকারি কর্তাদের লোকে কেন সন্দেহ করবে বলে রাজশেখর বসু মনে করেছেন?

৩. ব্যবসায়ীরা কীভাবে তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হয়?

৪. 'সত্যমেব জয়তে' এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদা হানি কী ভাবে হচ্ছে?

৫. রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করলে তার প্রতি অবিচার কেন করা হবে?

৬. রূপকথা বাস্তব জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা কীভাবে পূর্ণ করে তোলে, সংক্ষেপে বলুন।

৭. রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার কার জন্যে? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮. রূপকথা কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৯. রামমোহন রায় কেন "লোকপূজিত ধর্মগুরু" রূপে গণ্য হন নি?

১০. "রক্ষয়িত্রী শক্তি অর্থে নিছক গোঁড়ামি নয়"—এই কথার তাৎপর্য কী?

১১. বাঙালির "পূর্ণ সার্থকতা" কোথায় নিহিত?

১২. কী অবস্থা ঘটলে সমাজ ও জাতি টিকতে পারে না?

১৩. বিক্রমাদিত্য রাজকন্যাকে কীভাবে বিয়ে করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

১৪. জার্মন গল্পে উল্লেখিত রাজা সৈনিককে কেন জামাই করতে চেয়েছিলেন?

১৫. গ্রিমের গল্পে, রাজা "ছেলেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন" কী কারণে?

১৬. 'গল্পের গাঁটছড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত তিনটি অনুরূপ গল্পের জাত কীভাবে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. নন্দ গোয়ালা "গলার কণ্ঠির দিব্যি" দিয়ে কি বলেছিল?

২. শিউরাম পাঁড়ে "এ ছিয়া ছিয়া" কখন বলেছিল?

৩. 'Hydrogenated Oil' কী কাজে অসৎ ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে?

৪. কোথা থেকে আনা ময়দা লুচি বেলার সময়ে "স্থিতিস্থাপক" বলে মনে হয়?

৫. দুর্ভিক্ষের সময়ে কুকুরের মাংস কে খেয়েছিলেন?

৬. ইংরেজি সাহিত্যে ১৮ শতাব্দীর মধ্যভাগে কী হয়?

৭. রূপকথার "ছদ্মবেশ" খুললে কী ঘটবে?

৮. "আমাদের গোপন অন্তঃপুরশায়িনী প্রেয়সী" কে?

৯. শ্বেতবসন্তের গল্পে কিসের ছায়াপাত ঘটেছে?

১০. রবীন্দ্রনাথের কোন্ কাব্যে "রূপকথার মায়াময় স্পর্শটি সজীব" হয়ে আছে?

১১. ১৮৬০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত কার "জীবন ধীরমন্থর গতিতে" চলেছিল?

১২. বাঙালির কী বলে খ্যাতি আছে?

১৩. বাঙালির জ্ঞানের দিকটা কোথায় প্রকাশ পেয়েছে?

১৪. মল্লনৃত্য, রায়বেঁশে নাচ ও ব্রত-নৃত্য কিসের প্রমাণ?

১৫. হ্যালেডের সংগৃহীত গল্পটি কবে, কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?

১৬. ১৯৩৫ সালে হেড্‌উইগ সুরম্যান কী করেছিলেন?

১৭. Vampire মানে কী?

১৮. মানুষের স্মৃতি কিসের "মতো রক্ষিত হয়ে এসেছে"?

১৯. বিক্রমাদিত্য কোথায় রাজত্ব করতেন?

২০. তাল-বেতাল কী করেছিল?